ট্রান্সপারেন্সি
ইন্টারন্যাশনাল
বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

১৮ আগস্ট ২০১১

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ

গবেষণা উপদেষ্টা
অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল
চেয়ারপারসন, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

এম হাফিজউদ্দিন খান
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ
সদস্য, ট্রাস্টি বোর্ড, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
রুমানা শারমিন, *অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো (রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি)*
ফাতেমা আফরোজ, *অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো (রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি)*
সাধন কুমার দাস, *ফেলো (রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি)*
শাহজাদা এম আকরাম, *সিনিয়র ফেলো (রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি)*

গবেষণা সহযোগী
নিহার রঞ্জন রায়
মো. বুলবুল আহমেদ

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন
তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে নূর ইকবাল তালুকদার, হুর-এ-জান্নাত, এস এম রেজাউল করিম, এবং তানভীর শরীফ, এবং প্রতিবেদন পর্যালোচনার জন্য টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের ইফতেখার আহমেদ চৌধুরী, মো. ওয়াহিদ আলম, মু. জাকির হোসেন খান, মো. রেজাউল করিম, হাবিবুর রহমান, শহীদুল ইসলাম ও কবির আহমেদ, এবং অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
বাড়ি # ১৪১, সড়ক # ১২, ব্লক # ই
বনানী, ঢাকা ১২১৩
ফোন: ৮৮০-২-৮৮২৬০৩৬
ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৯৮৮৪৮১১
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ*

সার-সংক্ষেপ

১.১ প্রেক্ষাপট

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্ধারিত সময়ের প্রায় দুই বছর পর অনুষ্ঠিত নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে যেসব বিষয়ে জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় তার মধ্যে সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ অন্যতম। জনগণের দুর্নীতিবিরোধী এবং সুশাসনের চাহিদার সরাসরি প্রতিফলন দেখা যায় প্রধান দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহারে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি প্রতিরোধ এবং বিশ্বমন্দার মোকাবিলায় সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য ও বৈষম্য রোধ, এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা - এই পাঁচটি বিষয়কে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। ইশতেহারের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকারের মধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করা, নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার, জাতীয় সংসদকে কার্যকর করা, দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রতিষ্ঠা, এবং তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ক্ষমতাধর ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ, সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেওয়া, এবং স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন ও ন্যায়পাল নিয়োগের অঙ্গীকার করা হয়।

অন্যদিকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) নির্বাচনী ইশতেহারে সরকারের জবাবদিহিতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়। ইশতেহারে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার কথা বলা হয়। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচিত প্রতিনিধির সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়। জাতীয় সংসদকে কার্যকর করতে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলের সাথে আলোচনা, স্থায়ী কমিটিগুলো দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে গঠন, এবং বিরোধী দলের সদস্যদের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ, এর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, এবং সব ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে সরকার গঠন করার পর গত দুই বছর কয়েকটি সংবাদপত্র জনমত জরিপ পরিচালনা করে যার মাধ্যমে সরকারের কার্যক্রমের প্রতি জনগণের মনোভাব ও মূল্যায়ন তুলে ধরে। তবে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের কোনো গবেষণা-ভিত্তিক উদ্যোগ দেখা যায়নি। যেহেতু আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারের মূল বক্তব্য ছিল সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ, সেহেতু সরকার গঠনের পর প্রধান সরকারি দল হিসেবে কিভাবে এই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করছে এবং এক্ষেত্রে কতটুকু অগ্রগতি হচ্ছে তা নিরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।

অন্যদিকে বাংলাদেশের সরকার ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে বিভিন্ন নীতিগত সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিরোধী দলের ভূমিকা থাকে না। তবে সরকার গঠন না করলেও প্রধান বিরোধী দল তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সরকারের পাশাপাশি সংসদে বিরোধী দল হিসেবে (যেমন বিভিন্ন আইন ও রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে) এবং দুর্নীতি প্রতিরোধে (যেমন দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষমতায়ন) কিভাবে ভূমিকা রাখছে তাও পর্যবেক্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি

এই গবেষণার উদ্দেশ্য নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধের ওপর প্রধান সরকারি ও বিরোধী দলের দেওয়া নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা, এবং এর মাধ্যমে তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করা।

এই গবেষণা মূলত গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণ-নির্ভর। এখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উৎসের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার। পরোক্ষ উৎসের মধ্যে রয়েছে

---

* ২০১১ সালের ১৮ আগস্ট ঢাকায় অনুষ্ঠিত প্রেস কনফারেন্সে উপস্থাপিত। গবেষণা সম্পাদন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন করেছেন টিআইবি'র রিসার্চ অ্যান্ড পলিসি বিভাগের সিনিয়র ফেলো শাহজাদা এম আকরাম, ফেলো সাধন কুমার দাস, এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ফেলো ফাতেমা আফরোজ ও রুমানা শারমিন।

নির্বাচনী ইশতেহার, সরকারি নথিপত্র ও গেজেট, প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন, বই, প্রবন্ধ, সংবাদপত্র এবং ওয়েবসাইট। প্রধান সরকারি দলের নির্বাচনী ইশতেহার পর্যালোচনা করে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য সহায়ক নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি থেকে ১২টি ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়, এবং সেসব ক্ষেত্রের জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়। প্রাথমিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করার পর অন্যান্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উৎস হতে এই তথ্যের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতা যাচাই করা হয়। পরবর্তীতে এসব তথ্য নির্দিষ্ট কাঠামোর ভিত্তিতে সন্নিবেশিত ও উপস্থাপিত হয়। এই প্রতিবেদনে ২০০৯ এর জানুয়ারি থেকে ২০১১ এর জুলাই পর্যন্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

২. গবেষণার ফলাফল

নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট জয়লাভ করে, এবং আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করে। নির্বাচনের পর নতুন সরকার প্রথম বছরে বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি, এবং রেমিটেন্স বৃদ্ধি ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে। তবে একইসাথে নতুন সরকারকে বিভিন্ন জাতীয় সংকট যেমন বিডিআর জওয়ানদের বিদ্রোহ ও ঘূর্ণিঝড় 'আইলা'সহ অন্যান্য অভ্যন্তরীণ সমস্যা মোকাবেলা করতে হয়। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য, বিদ্যুৎ উৎপাদন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, এবং সরকারি দলের সমর্থক সংগঠনগুলোর টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, দখল-সন্ত্রাস ইত্যাদি ছিল নতুন সরকারের জন্য চলমান চ্যালেঞ্জ। এছাড়া তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল এবং বিরোধী দলের অংশগ্রহণ ছাড়াই সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী সম্পন্ন করা, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে স্বচ্ছতার অভাব, বড় কয়েকটি প্রকল্পের জন্য জমি অধিগ্রহণে স্থানীয় জনগণের সাথে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি সৃষ্টি, মানবাধিকার পরিস্থিতির ব্যাপক অবনতি, এবং আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানে ব্যর্থতার কারণেও সরকার সমালোচিত হয়।

২.১ দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি দমন কমিশনের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে শক্তিশালী করা, দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা, ক্ষমতাধরদের বার্ষিক সম্পদ বিবরণ দেওয়া, এবং রাষ্ট্র ও সমাজের সকল স্তরের ঘুষ, দুর্নীতি উচ্ছেদ, অনুপার্জিত আয়, ঋণখেলাপি, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, কালোটাকা ও পেশীশক্তি প্রতিরোধ ও নির্মূলে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।

দুর্নীতি প্রতিরোধে সরকারের যেসব ইতিবাচক পদক্ষেপ লক্ষ করা যায় তার মধ্যে দুর্নীতি দমনের জন্য সহায়ক তথ্য অধিকার আইন ও জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান সুরক্ষা আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা, দুর্নীতির অভিযোগকারীর নিরাপত্তা বিধান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন, জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ, অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের পর্যালোচনা (Peer Review) ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যালোচনা (Parallel Review), দুদকের জন্য ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ, এবং দুদকে উপ-পরিচালক, সরকারী পরিচালক এবং উপ-সহকারী পরিচালকের বিভিন্ন পদে প্রায় ৮০ জন নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও দুর্নীতি প্রতিরোধের অংশ হিসেবে মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সরকারি চাকুরেদের সম্পদ বিবরণী দাখিল, যাচাই ও সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

অন্যদিকে সরকার নেতিবাচক কিছু পদক্ষেপ নেয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দুদক আইন ২০০৪' এর সংশোধনী বিল সংসদে উত্থাপন। দুদক আইন ২০০৪ সংশোধন করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়, যা কয়েকটি সংশোধনের সুপারিশ করে। দুদক আইন সংশোধনের যেসব উদ্যোগ প্রস্তাব করা হয়েছে সেগুলো বাস্তবায়িত হলে দুর্নীতি দমনে দুদকের ক্ষমতা বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমে যাবে। প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ছাড়া দুদকের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা দেখা যায় না। এছাড়াও সরকারি দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুদকের করা মামলা প্রত্যাহারের প্রস্তাব, রাজনৈতিক বিবেচনায় দুর্নীতির মামলা খারিজ, এবং ২০০৯-১০, ২০১০-১১, এবং ২০১১-১২ তিন অর্থবছরেই কালো টাকা সাদা করার সুযোগ অব্যাহত রাখা দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

২. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা

আওয়ামী লীগের অন্যতম অঙ্গীকার ছিল কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, রাষ্ট্রের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কিছু সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার দেওয়া, একটি সর্বসম্মত আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন করা, এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইতিবাচক পরিবর্তন করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয় নির্বাচনী ইশতেহারে।

নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জারিকৃত ১২২টির মধ্যে ৪০টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করার জন্য সংসদে উত্থাপন করা হয়। প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো (৪৮টি) স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। সংসদে নোটিশ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতির প্রবর্তন, এবং আলোচনায় অংশগ্রহণের সময় নিয়ন্ত্রণে স্বয়ংক্রিয় মাইক্রোফোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। 'সংসদ সদস্য আচরণবিধি বিল ২০০৯' বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপন করা হয়। এছাড়াও 'সংসদ বাংলাদেশ' নামে সরকারি টেরেস্ট্রিয়াল চ্যানেল চালু করা হয় যা অষ্টম অধিবেশন থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে।

তবে এসব ইতিবাচক উদ্যোগ সত্ত্বেও নবম সংসদে বিরোধী দলের অনুপস্থিতি, কোরাম সংকট, দলীয় নেতৃত্বের প্রশংসা ও প্রতিপক্ষ দলের সমালোচনা অব্যাহত ছিল। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্যের ভিন্নমত প্রকাশের জন্য সহায়ক কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চাইতে ভিন্ন বিষয় নিয়ে কোনো কোনো স্থায়ী কমিটি সময় ব্যয় করে। স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা আছে এমন সদস্যদের কয়েকটি স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান বিল, ২০১০' ও 'সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১১' ছাড়া সংসদে উত্থাপিত কোনো বিলের খসড়া প্রকাশ করা হয়নি। এছাড়া বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে সংসদে সাধারণ আলোচনা হয়নি।

৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

নির্বাচনী ইশতেহারে বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করা, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় যেসব ইতিবাচক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন, বিচার বিভাগের আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি, নিম্ন আদালতে ২০৭ জন এবং হাইকোর্টে ৪৫ জন বিচারক নিয়োগ, দুই বছরে নিম্ন আদালতে ১৭ লাখের বেশি মামলার নিষ্পত্তি, বৃহত্তর ১৯ জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য গাড়ি বরাদ্দ এবং ২৭ জেলায় নতুন কোর্ট বিল্ডিং স্থাপনের জমি অধিগ্রহণসহ অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ। এছাড়াও উচ্চ আদালতে অব্যবস্থাপনা ও মামলার নথিপত্র সংরক্ষণে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় যার ফলে ২০১০ এর অক্টোবর থেকে ২০১১ এর ১২ মে পর্যন্ত ৯২,০৬১ মামলার নিষ্পত্তি হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় প্রকাশ এবং পাঁচ জনের ফাঁসি কার্যকর, মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের উদ্যোগ, এবং ১৯৭১ এর পর থেকে দায়েরকৃত সব 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত' মামলা খতিয়ে দেখার উদ্যোগ ছিল অন্যান্য ইতিবাচক উদ্যোগ।

তবে দেখা যায় নিম্ন আদালতে বিচারক নিয়োগ থেকে শুরু করে বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রভাব এখনো বিদ্যমান। এছাড়া নিম্ন আদালতের স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিচার বিভাগে নানাবিধ অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এখনো উচ্চ এবং নিম্ন আদালতে বিচারক সংকট রয়েছে। বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার অঙ্গীকার করা হলেও তা অব্যাহত রয়েছে। আড়াই বছরে কারা হেফাজতে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে ৬১২ জনের মৃত্যু ঘটে। এছাড়াও রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা বলে ডাকাতি, হত্যা ও দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নেওয়া হয়। মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীদের রাজনৈতিক বিবেচনায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদানের কারণেও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মূল চেতনা ব্যাহত হচ্ছে।

৪. তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা

নির্বাচনী ইশতেহারে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য-প্রবাহের অবাধ চলাচল সুনিশ্চিত ও সংরক্ষণ করা, মন্ত্রীসভার সব সদস্য এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ করা, এবং প্রতি দফতরে নাগরিক সনদ উপস্থাপন করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।

এক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগের মধ্যে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন প্রণয়ন, ৪,৫০১টি ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র' চালু, ই-তথ্যকোষ চালু, এবং তথ্য সরবরাহের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে ৯,৭৮০ জনকে (সরকারি ৭,৫৪২, বেসরকারি ২,২৩৮) নিয়োগ উল্লেখযোগ্য। তথ্য কমিশন গঠন করা হয়। নির্বাচন কমিশনে নির্বাচনের পূর্বে দাখিল করা সব সংসদ সদস্যের সম্পদের হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়, প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের আয়কর বিবরণী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, এবং মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টাসহ উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের আয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রধান বিচারপতিসহ মোট ১৯ জন বিচারপতি সম্পদের হিসাব দাখিল করেন। বিভিন্ন সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়। এছাড়াও হয়রানি রোধ করতে সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে পরপর তিনবার সমন জারির পর সাড়া না পেলে তারপর গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার বিধান করা হয়।

তবে এর পাশাপাশি তথ্য কমিশনের বিধিমালা প্রণয়নে দীর্ঘসূত্রতা, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা নিয়োগে শ্লথগতি, প্রস্তাবিত জনবল ও অর্গানোগ্রাম চূড়ান্ত না করা প্রভৃতি সীমাবদ্ধতার কারণে কমিশন কার্যকর হচ্ছে না। মন্ত্রীসভার সব সদস্য এবং সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস প্রতিবছর জনসমক্ষে প্রকাশ করার কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মন্ত্রিপরিষদ, উপদেষ্টা ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের আয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া সংক্রান্ত নির্দেশের আওতায় সংসদ সদস্যদের আনা হয়নি, এবং এসব তথ্য প্রকাশ করা হবে কিনা তা প্রধানমন্ত্রীর হাতে রাখা হয়েছে। দুইটি টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচার বাতিল ও একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশনা সাময়িক সময়ের জন্য বাতিল করার জন্য সরকারের সমালোচনা হয়।

৫. প্রশাসনের সংস্কার

ইশতেহারে দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক গণমুখী প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করা, যোগ্যতা, জ্যেষ্ঠতা ও মেধার ভিত্তিতে সব নিয়োগ ও পদোন্নতি নিশ্চিত করা, প্রশাসনিক সংস্কার, তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং ই-গভর্নেন্স চালু করা, এবং সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন করা হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়।

প্রশাসনের সংস্কারের উদ্দেশ্যে 'সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১০' এর খসড়া মন্ত্রিসভায় অনুমোদন করা হয়। এছাড়াও নন-ক্যাডার নিয়োগবিধি সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর শূন্য পদের ৫০% পূরণে সরকারি কর্ম-কমিশনকে সুপারিশের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, এবং সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মোট শূন্য পদের ৯০% পর্যন্ত নিয়োগে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে প্রশাসন সংস্কার ও বাস্তবায়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়।

প্রশাসনে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রশাসনে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং বিভিন্ন খাত যেমন সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ডিজিটালাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। মূল বেতনের ওপর গড়ে ৫২% হারে বৃদ্ধি করে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে স্কেল ঘোষণা করা হয়। এছাড়াও তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা করা হয়, এবং রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন' গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

তবে এসব ইতিবাচক উদ্যোগের বিপরীতে অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনের দলীয়করণ লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন অনিয়ম, প্রশাসনিক ত্রুটি এবং সরকারি দলের প্রভাবশালীদের প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের কারণে সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ১৮ মাসে ৯,০৯৫টি পদের জন্য নিয়োগ বা চূড়ান্ত ফলাফল স্থগিত করা হয়। পদোন্নতিতে রাজনৈতিক বিবেচনা, রাজনৈতিক বিবেচনায় ওএসডি করা, এবং চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অব্যাহত রয়েছে। কোনো প্রতিষ্ঠানে ন্যায়পাল নিয়োগ করা হয়নি, বরং কর ন্যায়পাল পদ অবলুপ্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত স্থায়ী বেতন কমিশন ও স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠিত হয়নি। প্রশাসনের কম্পিউটারায়নে প্রয়োজনীয় গতির অভাব লক্ষ করা যায়।

৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বাধীনতা ও শক্তিশালীকরণ

আওয়ামী লীগ দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলোকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা এবং তাদের বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং কল্যাণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের অঙ্গীকার করে।

এর মধ্যে সরকার বেশ কিছু ইতিবাচক উদ্যোগ নিয়েছে। ৩২,০০০ পুলিশ নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যার মধ্যে ১৩,৩৯১ পুলিশ নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, এবং ৬৭৩টি প্রথম শ্রেণীর পদ সৃষ্টির নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। 'পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' (পিবিআই) নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রতিটি থানায় অতিরিক্ত একজন ইন্সপেক্টরের পদ সৃষ্টি করা হয়। ট্রাফিক পুলিশের জন্য বেসিকের ৩০% ভাতা ঘোষণা দেওয়া হয়। সব স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একই রেশনিং ব্যবস্থা, এবং মামলার তদন্ত করার জন্য 'তদন্ত ভাতা' ও 'ঝুঁকি ভাতা' প্রচলন করা হয়েছে।

তবে এখনও পর্যন্ত বর্তমানে কার্যকর 'পুলিশ অ্যাক্ট ১৮৬১' হালনাগাদ ও সংশোধন করে প্রস্তাবিত 'পুলিশ অর্ডিন্যান্স ২০০৭' চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়নি। হত্যাকাণ্ড, চাঁদাবাজি এবং টেন্ডারবাজির মতো মারাত্মক অপরাধ অব্যাহত রয়েছে। এখনো পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। পুলিশ নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অব্যাহত রয়েছে। সরকারি দলের সমর্থক ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের বিভিন্ন অপরাধের সাথে জড়িত হওয়া এবং তা প্রতিরোধে সরকারের ব্যর্থতা সরকারের অন্যান্য অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে।

৭. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা

আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণ করে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, পরিকল্পিত পল্লী জনপদ এবং উপজেলা সদর ও বর্ধিষ্ণু শিল্পকেন্দ্রগুলোকে শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা হবে বলে অঙ্গীকার করে।

এসব প্রতিশ্রুতি পূরণে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা হয়। উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। সাতটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে দেওয়া হয়, এবং দশটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপজেলা পরিষদের অধীনে দেওয়া হয়। এছাড়াও সরকার পৌরসভা ও ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের উদ্যোগ গ্রহণ করে - ৪,২৮৫টি ইউনিয়ন পরিষদ, ২৬২টি পৌরসভায় নির্বাচন ও ৪৮১টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

তবে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার কথা বললেও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে (উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ) সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রভাব ও ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। স্থানীয় সরকার কমিশন সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রথম অধিবেশনের মধ্যে পাস না করায় কমিশন বিলুপ্ত হয়ে যায়। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা নির্বাচন দ্রুত অনুষ্ঠানের জন্য এ সংক্রান্ত আইন সংশোধনে সরকারের দীর্ঘসূত্রতা লক্ষ করা যায়। জেলা পরিষদ নির্বাচনেও সরকারের কোনো উদ্যোগ এখন পর্যন্ত লক্ষ করা যায় না।

৮. নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ

নির্বাচনী ইশতেহারে নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন পদ্ধতির চলমান সংস্কার ও প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়।

'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯' এবং 'নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন ২০০৯' প্রণীত হয়। ফলে নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে আসে। নিজস্ব জনবল দিয়ে উপ-নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন। এছাড়াও 'ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন ২০১০' এর মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

তবে এর পাশাপাশি উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের হাতে না রেখে সরকারের হাতে রাখা হয়েছে। জাতীয় নির্বাচনে তৃণমূলের সুপারিশ অনুযায়ী মনোনয়নকে বাধ্যতামূলক করা হয়নি, যা সংশোধিত 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২' এ অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজনৈতিক বিবেচনায় ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন এখনো করা হয়নি। এছাড়া বিভিন্ন উপ-নির্বাচন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অপ্রতুল নিরাপত্তা ব্যবস্থার কারণে নির্বাচন ও নির্বাচন-পরবর্তী সময় বেশ কয়েকটি এলাকায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা বাড়ানো হয়নি।

৯. মানবাধিকার নিশ্চিত করা

মানবাধিকার লঙ্ঘন কঠোরভাবে বন্ধ করার লক্ষ্যে স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠনের অঙ্গীকার করে আওয়ামী লীগ।

এক্ষেত্রে সরকারের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯' প্রণয়ন এবং এর অধীনে একটি জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠন করা। কমিশনের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ৪৯ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এছাড়াও ফতোয়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদানকে আইন বহির্ভূত ঘোষণা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে বোরখা পরা বাধ্যতামূলক না করা, এবং ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশুর দায়িত্ব রাষ্ট্রের গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

তবে সরকার মানবাধিকার কমিশন গঠন করলেও মানবাধিকার কমিশনে জনবল নিয়োগে সরকারি উদ্যোগের অভাব লক্ষ করা যায়। 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিধিমালা ২০০৯' এবং 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯' অনুমোদন করেনি সরকার। এছাড়া মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিভিন্ন ঘটনা যেমন বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, তৈরি পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের হয়রানি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন, আটকদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সামরিক বাহিনীর নির্যাতন, নারী নির্যাতন, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ছিল। মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব লক্ষ করা যায়।

১০. নারীর ক্ষমতায়ন

আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারে নারীর ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়, যার মধ্যে ১৯৯৭ সালের নারী উন্নয়ন নীতির পুনর্বহাল, জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা, নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নেয়া, এবং নারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়।

এর মধ্যে 'নারী উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১' প্রণীত হয়। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় যেমন স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, কৃষি, নারী ও শিশু মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নারী মন্ত্রীদের ওপর দেওয়া হয়, এবং প্রধানমন্ত্রীর অধীনে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদসহ ১২টি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব রয়েছে। সংসদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ যেমন সংসদ নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, হুইপ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসেবে নারী সদস্যরা দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। 'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০' প্রণয়ন করা, নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি, এবং সিডও সনদের আওতায় রিপোর্ট দাখিল করার সিদ্ধান্ত এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পদক্ষেপ। নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু-কিশোরদের জন্য ঢাকায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু এবং দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মস্থলে অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নারীদের উত্যক্ত করা বন্ধ করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

অন্যদিকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩% করার পরিবর্তে সংশোধিত সংবিধানে সংরক্ষিত নারী আসনের সংখ্যা ৪৫ থেকে বাড়িয়ে ৫০ করা হয়। সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার বিষয়ক কোনো আইন প্রণীত হয়নি, যেমন

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ বিচ্ছেদ বা সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের বৈষম্য দূর করার জন্য কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও নারী নির্যাতন অব্যাহত ছিল। নারী নির্যাতন রোধে সরকারের কিছু কিছু উদ্যোগ থাকলেও তা যথেষ্ট ছিল না।

১১. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন

আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সমান অধিকার নিশ্চিত করা, সংখ্যালঘু, আদিবাসী ও ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইনের অবসান এবং বিশেষ করে পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করে।

এই ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ ছিল সংসদে আদিবাসী সংক্রান্ত ককাস গঠন করা। এছাড়া খাগড়াছড়ি বিচারিক হাকিম আদালত থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর আটজন কর্মচারীকে ভূমি কমিশনে নিয়োগ দেওয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করার অংশ হিসেবে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হয়।

এর বিপরীতে সংশোধিত সংবিধানে বাংলাদেশের অধিবাসীদের বাঙ্গালী অখ্যায়িত করা; আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ‘উপজাতি’ হিসেবে আখ্যায়িত করার মাধ্যমে বিতর্কের সৃষ্টি হয়। আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে ‘নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী’ ও ‘উপজাতি’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়, এবং সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে শক্ত অবস্থান নেওয়া হয়। নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত আইনে সবগুলো আদিবাসী গোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করা হয়নি। এছাড়াও ‘অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১’ এর সংশোধনে সরকারের দীর্ঘসূত্রতা লক্ষণীয়। ভূমি কমিশন আইন সংশোধনে দীর্ঘসূত্রতার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে কোনো অগ্রগতি হয়নি।

১২. এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা

নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করে। এর অংশ হিসেবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন না করার কারণে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ৫৪৬টি এনজিও’র নিবন্ধন বাতিল করে। সরকারের পক্ষ থেকে এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, বিভিন্ন ফর্ম ও আবেদনপত্র সংশোধন, এবং এনজিও ডাটাবেজ এবং আর্থিক তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

তবে এনজিওদের সাথে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে এ খাতের আইন, এনজিওদের নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার পুনর্গঠন, এবং এনজিও ও সরকারের জবাবদিহিতার মাপকাঠি পুনঃনির্ধারণের উদ্যোগ নিলেও তা বর্তমানে এখনো প্রক্রিয়াধীন। এনজিও’দের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সোস্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগের উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক ও যথাযথ তথ্যের অভাবে এটি নিয়ে এনজিও খাতে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়।

১৩. নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়ন: প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা

প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল – যেমন সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচনের পর শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সকল নির্বাচিত প্রতিনিধির সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা হবে, এবং সংসদ কার্যকর করার লক্ষ্যে সংসদ সদস্যরা সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের বেশি সংসদ বর্জন করতে পারবে না, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা, শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করা – এসব কোনোটিই তারা নিজেদের ক্ষেত্রে মেনে চলেনি।

প্রধান বিরোধী দল হিসেবে বিএনপি ধারাবাহিকভাবে সংসদ বর্জন (৭৪% কার্যদিবস) করে। তবে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমে বিরোধী দলের সদস্যরা নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন। বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন ও শক্তিশালী করার পাশাপাশি জনগণকে এ বিষয়ে সচেতন করার প্রতিশ্রুতি দিলেও বর্তমান সরকারের দুর্নীতি দমন কমিশন আইনের সংশোধনীর প্রস্তাবের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান নেয়নি। এই সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত ও বাস্তবায়িত হলে দুদক একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে।

তবে সম্প্রতি প্রথমবারের মত ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কালো টাকা বিনিয়োগের সুবিধা না দেওয়ার দাবি তুলেছে বিএনপি। এছাড়া এই প্রথম ভারতের সাথে ট্রানজিট ও অন্যান্য চুক্তি প্রকাশ করার দাবি জানিয়েছে বিএনপি।

১৪. উপসংহার

আওয়ামী লীগের সুশাসন সংক্রান্ত যেসব নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত সূচক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এসব ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম মিশ্র। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশন ও প্রক্রিয়ার সংস্কার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের গৃহীত কয়েকটি পদক্ষেপ ছিল ইতিবাচক। অন্যদিকে

দুর্নীতি দমন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সংসদকে কার্যকর করা, আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা, পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের সব পদক্ষেপ ইতিবাচক ছিল না। সার্বিকভাবে বলা যায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি সুষ্ঠুভাবে পূরণের পথে এগিয়ে গেলেও গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্রে এখনো প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি।

ওপরের আলোচনা থেকে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বর্তমান সরকারের যে ধারা লক্ষ করা যায় তা হল:

- দুর্নীতি দমনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং দুর্নীতি দমনের জন্য সহায়ক পরিবেশ নিশ্চিত করার পরিবর্তে অন্যান্য প্রতিষ্ঠান যেমন সংসদের স্থায়ী কমিটির বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত উদ্যোগ গ্রহণ।
- প্রশাসন এবং স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রে একদিকে সংসদ সদস্য অন্যদিকে সরকারি কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে নিশ্চিত করা; একইসাথে সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের স্বার্থ রক্ষা।
- স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশে সরকারের নির্বাহী বিভাগ এবং জন-প্রতিনিধিদের লক্ষণীয় অনীহা।
- গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের (দুর্নীতি দমন কমিশন, তথ্য অধিকার কমিশন, মানবাধিকার কমিশন, সরকারি কর্ম কমিশন) প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়ার পরিবর্তে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বর্তমান সক্ষমতাকে দুর্বল করার উদ্যোগ গ্রহণ।
- মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সরকারের নেতিবাচক ভূমিকা।

১৫. সুপারিশ

সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকারের অনেক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলেও অনেকগুলোই প্রত্যাশিত পর্যায়ে পূরণ হয়নি বলে ওপরের আলোচনা থেকে লক্ষ করা যায়। বিশেষকরে যেসব ক্ষেত্রে সরকারের উত্তরণের সুযোগ রয়েছে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন সেগুলো হচ্ছে –

১. দুর্নীতি দমনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইনে শুধু এমন সংশোধন আনা উচিত যেন দুদক কার্যকর ও স্বাধীনভাবে, বিশেষকরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে। রাজনৈতিক বিবেচনায় মামলা প্রত্যাহার না করে বিচারিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করতে হবে।

২. সংসদ কার্যকর করার ক্ষেত্রে প্রধান বিরোধী দলের সংসদে অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য সরকার ও বিরোধী দল উভয়ের পক্ষ থেকে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত কমিটিসহ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি সংসদীয় স্থায়ী কমিটি'র চেয়ারম্যান বিরোধী দল থেকে নিতে হবে, এবং সংসদের দ্বিতীয় ডেপুটি স্পিকার পদে বিরোধী দল থেকে নির্বাচন করতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের আগে বিরোধী দল, জনগণ ও বিশেষজ্ঞদের মতামত নিতে হবে। সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো থেকে স্বার্থের দ্বন্দ্ব রয়েছে এমন সদস্যদের সদস্যপদ প্রত্যাহার করতে হবে, এবং কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নে উদ্যোগ নিতে হবে। সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি সংক্রান্ত বিল দ্রুত আইনে পরিণত করতে হবে।

৩. প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক তথ্য প্রতি বছর নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে।

৪. সংবিধান ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সাথে সঙ্গতি রেখে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে।

৫. সরকারি খাতে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ, রাজনৈতিক বিবেচনায় নিয়োগ, এবং সরকারি কর্মকর্তাদের ওএসডি করে রাখার প্রবণতা থেকে বের হয়ে আসতে হবে।

৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে। এজন্য সংশোধিত পুলিশ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৭. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করার জন্য এসব প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্য ও উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাধান্য হ্রাস করার উদ্যোগ নিতে হবে। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধন করতে হবে।

৮. মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে সরকারকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। মানবাধিকার কমিশনকে কার্যকর করার জন্য একে ক্ষমতায়িত করতে হবে। মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তিদের আইনের আশ্রয় লাভ নিশ্চিত করা, এবং কারা হেফাজতে মৃত্যু বা নির্যাতন, বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিচার সম্পন্ন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে।

৯. জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিতে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সমান অধিকারের চেতনা সমুন্নত রাখতে হবে। জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩ শতাংশে উন্নীত করতে হবে, এবং এসব আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। নারীর জন্য বৈষম্যমূলক আইনের সংশোধন করতে হবে।

১০. নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক আইন ও অন্যান্য ব্যবস্থার অবসান করার জন্য এসব জনগোষ্ঠীর সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত। পার্বত্য শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করার জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন আইন সংশোধন এবং তা অনুযায়ী কমিশন পুনর্গঠন করতে হবে, যেন আদিবাসীদের ভূমিকা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শক্তিশালী থাকে।

১১. এনজিও খাতের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন এ খাতের সাফল্য ও স্বকীয়তার ধারা অব্যাহত থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে এবং এ খাতকে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

এক নজরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
১. দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ		
আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য বৃদ্ধি	▪ দুর্নীতি দমনের জন্য সহায়ক তথ্য অধিকার আইন ও জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন প্রণয়ন এবং তথ্য কমিশন প্রতিষ্ঠা ▪ জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের কর্ম-পরিকল্পনা নির্ধারণ ▪ অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জাতিসংঘের দুর্নীতিবিরোধী সনদ বাস্তবায়নের পর্যালোচনা (Peer Review) ও বেসরকারি পর্যায়ে পর্যালোচনা (Parallel Review) ▪ দুদকের জন্য ঢাকায় এবং ঢাকার বাইরে প্যানেল আইনজীবী নিয়োগ ▪ উপ-পরিচালক, সরকারী পরিচালক এবং উপ-সহকারী পরিচালকের ৩৮৪টি শূন্য পদের বিপরীতে প্রায় ৮০ জন সহকারী পরিচালক ও উপ-সহকারী পরিচালক নিয়োগের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত	▪ দুদক আইন ২০০৪ সংশোধনের প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন যা বাস্তবায়িত হলে দুদকের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা হ্রাস পাবে ▪ দুদকের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকারের ইতিবাচক ভূমিকা না থাকা
সরকারের দুর্নীতিবিরোধী অবস্থান	▪ মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও প্রতিষ্ঠানভিত্তিক সরকারি চাকুরেদের সম্পদ বিবরণী দাখিল, যাচাই ও সংরক্ষণের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ	▪ সরকারি দলের নেতাদের বিরুদ্ধে দুদকের করা মামলা প্রত্যাহার ▪ ২০০৯-১০, ২০১০-১১, এবং ২০১১-১২ তিন অর্থবছরেই অপ্রদর্শিত আয় বৈধ করার সুযোগ অব্যাহত
২. কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা		
সংসদ কার্যকর করা	▪ সার্বিকভাবে সংসদে গড় উপস্থিতি ৬৬% ▪ নোটিশ গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রনিক পদ্ধতির প্রবর্তন ▪ আলোচনায় অংশগ্রহণের সময় নিয়ন্ত্রণে স্বয়ংক্রিয় মাইক্রোফোন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন ▪ 'সংসদ বাংলাদেশ' নামে সরকারি টেরেস্ট্রিয়াল চ্যানেল চালু	▪ অধিবেশন কক্ষে সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতি; দেরি করে উপস্থিতির কারণে কোরাম সংকট অব্যাহত ▪ সরকারদলীয় নেতৃত্বের অতি প্রশংসা ও বিরোধী দলের কঠোর সমালোচনা ও অসংসদীয় ভাষা ব্যবহার অব্যাহত ▪ বিরোধী দলের সংসদ বর্জন অব্যাহত (৭৪% কার্যদিবস); বিরোধী দলকে সংসদে ফিরিয়ে আনার উদ্যোগের অভাব ▪ বিভিন্ন জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং আন্তর্জাতিক চুক্তি নিয়ে সংসদে সাধারণ আলোচনা না হওয়া
আইন প্রণয়ন	▪ প্রথম অধিবেশনে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে জারিকৃত ১২২টির মধ্যে ৪০টি অধ্যাদেশ আইনে পরিণত করার জন্য উত্থাপন ▪ নয়টি অধিবেশনে ১৪৪টি আইন প্রণয়ন ▪ গুরুত্বপূর্ণ আইন - 'গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯', 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন, ২০১১', 'মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯', 'সন্ত্রাসবিরোধী আইন, ২০০৯', 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯', 'জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯', 'পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন, ২০১০' ▪ 'জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান বিল, ২০১০' ও 'সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১১' এর খসড়া জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে জনমত গ্রহণের জন্য প্রকাশ	▪ বিভিন্ন জন-গুরুত্বপূর্ণ আইন যেমন 'স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন', 'স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন', 'পাবলিক প্রকিউরমেন্ট (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন ২০০৯', 'শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০০৯' ইত্যাদি প্রণীত হওয়ার আগে জনমত যাচাই না করা
সংসদ সদস্যদের ভিন্নমত প্রকাশের অধিকার		▪ সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীতে ৭০ অনুচ্ছেদে সংসদ সদস্যের ভিন্নমত প্রকাশের জন্য সহায়ক কোনো পরিবর্তন না করা

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
সরকারের জবাবদিহি নিশ্চিত করা	▪ প্রথম অধিবেশনেই সবগুলো (৪৮টি) স্থায়ী কমিটি গঠন ▪ ১১টি কমিটির কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বৈঠক ▪ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিগুলোর মধ্যে ৩০টি কমিটির বার্ষিক প্রতিবেদন জমা ▪ কমিটির বৈঠকে বিরোধী দলের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ	▪ বর্তমান সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার চাইতে অন্যান্য বিষয় নিয়ে কোনো কোনো কমিটির সময় ব্যয় ▪ স্বার্থের সংশ্লিষ্টতা আছে এমন সদস্যের স্থায়ী কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি
আচরণ বিধিমালা প্রণয়ন	▪ 'সংসদ সদস্য আচরণ বিল, ২০১০' বেসরকারি বিল হিসেবে উত্থাপিত	
৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা		
বিচার বিভাগের প্রকৃত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা	▪ অধস্তন আদালতের বিচারকদের নিয়োগের জন্য জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশন গঠন ▪ প্রধান বিচারপতিসহ ১৯ জন বিচারপতির সম্পদের বিবরণী দাখিল ▪ বিচার বিভাগের আলাদা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি ▪ নিম্ন আদালতে ২০৭ বিচারক নিয়োগ; হাইকোর্টে ৪৫ জন বিচারক (স্থায়ী ১৩ জন এবং ৩২ জন অতিরিক্ত বিচারক) নিয়োগ; দুই বছরে নিম্ন আদালতে ১৭ লাখের বেশি মামলার নিষ্পত্তি ▪ বৃহত্তর ১৯ জেলার চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের জন্য গাড়ি বরাদ্দ এবং ২৭ জেলায় নতুন কোর্ট বিল্ডিং স্থাপনের জমি অধিগ্রহণসহ অবকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ ▪ উচ্চ আদালতে অব্যবস্থাপনা ও মামলার নথিপত্র সংরক্ষণে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ গ্রহণ ▪ সুপ্রিম কোর্টে জনগণকে তথ্য সরবরাহের জন্য একটি তথ্য সরবরাহ ইউনিট গঠন ▪ ১৯৭১ এর পর থেকে দায়েরকৃত সব 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত' মামলা খতিয়ে দেখার উদ্যোগ	▪ বিচার বিভাগের জন্য পৃথক সচিবালয় গঠন না করা ▪ সাচিবিক দায়িত্ব পালনকারী হিসেবে নিম্ন আদালতের প্রশাসনিক বিষয়ে আইন মন্ত্রণালয়ের প্রভাব অব্যাহত
বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা		▪ বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত ▪ আড়াই বছরে কারা হেফাজতে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে মৃত্যু ৬১২ জনের
বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার সম্পন্ন	▪ বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার চূড়ান্ত রায় প্রকাশ এবং পাঁচ জনের ফাঁসি কার্যকর	
যুদ্ধাপরাধের বিচার	▪ মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ	
আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা		▪ রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলা বিবেচনা করে ডাকাতি, হত্যা ও দুর্নীতির মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ; ১০,২৯৩টির মধ্যে ৬,৬৫৫টি মামলা প্রত্যাহারের সুপারিশ ▪ মৃত্যুদণ্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীদের রাজনৈতিক বিবেচনায় রাষ্ট্রপতির ক্ষমা প্রদানের কারণে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মূল চেতনা ব্যাহত
৪. তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা		
তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা	▪ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও বিধিমালা প্রণয়ন; জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশ সুরক্ষা প্রদান আইন প্রণয়ন ▪ ৪,৫০১টি ইউনিয়নে 'ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র' চালু ▪ তথ্য সরবরাহের জন্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে তথ্য কর্মকর্তা হিসেবে ৯,৭৮০ জনকে (সরকারি ৭,৫৪২, বেসরকারি ২,২৩৮) নিয়োগ ▪ ই-তথ্যকোষ চালু	▪ ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মৌলিক তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক না করা
তথ্য কমিশন গঠন	▪ তিন সদস্যবিশিষ্ট তথ্য কমিশন গঠন	
প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য ও	▪ নির্বাচন কমিশনে সব সংসদ সদস্যের নির্বাচনের পূর্বে দাখিল করা সম্পদের হিসাব ওয়েবসাইটে প্রকাশ	▪ প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য ও সংসদ সদস্যদের সম্পদের বার্ষিক হিসাব প্রকাশ না করা

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
তাদের পরিবারের সম্পদের হিসাব ও আয়ের উৎস জনসমক্ষে প্রকাশ	■ প্রধানমন্ত্রী ও সংসদ সদস্যদের আয়কর বিবরণী জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত ■ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপদেষ্টাসহ উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের আয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত	■ আয় ও সম্পদের হিসাব বিবরণী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া সংক্রান্ত নির্দেশের আওতায় সংসদ সদস্যদের আনা হয়নি
প্রত্যেক দফতরে নাগরিক সনদ উপস্থাপন	■ দ্বিতীয় প্রজন্মের নাগরিক সনদ তৈরির উদ্যোগ গ্রহণ	
গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও তথ্য প্রবাহের অবাধ চলাচল	■ সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে পরপর তিনবার সমন জারির পর সাড়া না পেলে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করার বিধান	■ বিতর্কিতভাবে দুইটি টেলিভিশন চ্যানেলের সম্প্রচার বন্ধ ও একটি দৈনিক সংবাদপত্রের প্রকাশনা সাময়িকভাবে বাতিল ■ আট দিনের জন্য সামাজিক যোগাযোগের ওয়েবসাইট 'ফেসবুক' বন্ধ
৫. প্রশাসনের সংস্কার		
দলীয়করণমুক্ত অরাজনৈতিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা	■ সিভিল সার্ভিস অ্যাক্ট ২০১০ এর খসড়া অনুমোদন; নন-ক্যাডার পদে নিয়োগ (বিশেষ) বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন; 'নন-ক্যাডার কর্মকর্তা ও কর্মচারী (জ্যেষ্ঠতা-পদোন্নতি) বিধিমালা ২০১১' জারি ■ প্রথম শ্রেণীর শূন্য পদের ৫০% পূরণে সরকারি কর্ম-কমিশনকে সুপারিশের ক্ষমতা প্রদান; সরকারি, আধা সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে মোট শূন্য পদের ৯০% পর্যন্ত নিয়োগে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন হবে না বলে সিদ্ধান্ত ■ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে প্রশাসন সংস্কার ও বাস্তবায়ন বিভাগ সৃষ্টি	■ বিভিন্ন অনিয়ম, প্রশাসনিক ত্রুটি এবং সরকারি দলের প্রভাবশালীদের প্রকাশ্য হস্তক্ষেপের কারণে সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে ১৮ মাসে ৯,০৯৫টি পদের জন্য নিয়োগ বা চূড়ান্ত ফলাফল স্থগিত ■ চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ অব্যাহত; আড়াই বছরে চুক্তির ভিত্তিতে ২১৫ জনের নিয়োগ ■ ৮৫১ কর্মকর্তাকে পদোন্নতি না দেওয়া ■ রাজনৈতিক কারণে ওএসডি করার প্রবণতা অব্যাহত; দুই বছরে বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা ৪৫৮
সরকারি কর্মকাণ্ডে কম্পিউটারায়ন ও ই-গভার্নেন্স চালু	■ শীর্ষ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের ই-মেইল অ্যাকাউন্ট, ল্যাপটপ, ওয়েবক্যাম, ইন্টারনেট মডেম ও স্ক্যানার প্রদান এবং ব্যবহারের ওপর প্রশিক্ষণ ■ নোটিশ, সার্কুলার ও চিঠিপত্র ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো; মাসিক বেতন বিল নির্ধারণের জন্য ডাটাবেজ সফটওয়্যার ব্যবহার ■ বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ■ বিভিন্ন খাত, যেমন সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, জাতীয় সংসদ, বিচার বিভাগ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি ডিজিটালাইজ করার উদ্যোগ গ্রহণ	■ প্রশাসনের কম্পিউটারায়নে প্রয়োজনীয় গতির অভাব ■ সরকারি ওয়েবসাইটগুলো নিয়মিতভাবে হালনাগাদ না করা
স্থায়ী বেতন কমিশন গঠন	■ মূল বেতনের ওপর গড়ে ৫২% হারে বৃদ্ধি করে সরকারি কর্মচারীদের জন্য সপ্তম পে স্কেল ঘোষণা	■ স্থায়ী বেতন কমিশন গঠিত না হওয়া
স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠন	■ তৈরি পোশাক শ্রমিকদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ঘোষণা; রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পপ্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি নির্ধারণের জন্য 'জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন' গঠনের নীতিগত সিদ্ধান্ত	■ স্থায়ী মজুরি কমিশন গঠিত না হওয়া
ন্যায়পাল নিয়োগ		■ ন্যায়পাল নিয়োগ না করা ■ কর ন্যায়পাল পদ অবলুপ্ত করা
৬. আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর স্বাধীনতা ও শক্তিশালীকরণ		
পুলিশ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীসমূহকে রাজনীতির প্রভাবমুক্ত, আধুনিক ও যুগোপযোগী করে গড়ে তোলা	■ ৩২,০০০ পুলিশ নিয়োগের সিদ্ধান্ত; ১৩,৩৯১ পুলিশ (এর মধ্যে ৬৩২ জন পরিদর্শক) নিয়োগের অনুমোদন; ৬৭৩টি প্রথম শ্রেণীর পদ সৃষ্টির নীতিগত সিদ্ধান্ত ■ 'পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন' (পিআইবি) নামে একটি পৃথক সংস্থা গঠনের উদ্যোগ ■ প্রতিটি থানায় অতিরিক্ত একজন ইন্সপেক্টরের পদ সৃষ্টি ■ পুলিশ বিভাগের মাঠ পর্যায়ের অফিসের জন্য গাড়ি কেনা বাবদ প্রায় ৪৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ	■ 'পুলিশ অ্যাক্ট ১৮৬১' হালনাগাদ ও সংশোধন করে তৈরি খসড়া 'পুলিশ আইন ২০০৭' চূড়ান্ত অনুমোদন না করা ■ বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক অপরাধ অব্যাহত ■ সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের টেন্ডারবাজি ও চাঁদাবাজি ■ পুলিশ নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ অব্যাহত

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
		■ পুলিশ বাহিনীকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা
বেতন-ভাতা, আবাসন ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি	■ ট্রাফিক পুলিশের জন্য বেসিকের ৩০% ভাতা (সর্বোচ্চ ২,৫০০ টাকা) ঘোষণা ■ আইজিপি থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত সব স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য একই রেশনিং ব্যবস্থা ■ মামলার তদন্ত করার জন্য 'তদন্ত ভাতা' ও 'ঝুঁকি ভাতা'	
৭. শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা		
ক্ষমতার বিকেন্দ্রায়ন করে ইউনিয়ন, উপজেলা ও জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করা	■ ৪,২৮৫টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ৪৮১টি উপজেলা পরিষদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত ■ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন ■ উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন এবং বেতন-ভাতা নির্ধারণ করে নতুন বিধিমালা প্রণয়ন ■ সাতটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ইউনিয়ন পরিষদের অধীনে দেওয়া; একইভাবে দশটি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপজেলা পরিষদের অধীনে দেওয়া	■ স্থানীয় সরকার কমিশন সংক্রান্ত অধ্যাদেশ প্রথম অধিবেশনের মধ্যে পাস না করায় কমিশন বিলুপ্ত ■ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্য এবং সরকারি কর্মকর্তাদের প্রভাব আইনের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ■ উপজেলা পরিষদ অকার্যকর করে রাখা ■ বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের জন্য সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনে সরকারের দীর্ঘসূত্রতা
জেলা পরিষদকে উন্নয়নের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা		■ জেলা পরিষদ নির্বাচন না হওয়া
উপজেলা সদরকে শহর-উপশহর হিসেবে গড়ে তোলা	■ ২৬২টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত ■ স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পৌরসভার অধীনে কাজ করার বিধান ■ স্থানীয় এলাকার সংসদ সদস্যদের পৌরসভায় উপদেষ্টার পদ ও ডেপুটি মেয়রের পদ বাতিল	
৮. নির্বাচন কমিশনের সংস্কার ও শক্তিশালীকরণ		
নির্বাচন কমিশন এবং নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার	■ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ (সংশোধন) আইন ২০০৯; নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আইন ২০০৯ প্রণয়ন; নির্বাচন কমিশন সচিবালয় নির্বাচন কমিশনের অধীনে নিয়ে আসা ■ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের ক্ষমতায়ন ■ নিজস্ব জনবল দিয়ে উপ-নির্বাচন, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশন এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজন	■ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়ার এখতিয়ার নির্বাচন কমিশনের হাতে না রেখে সরকারের হাতে রাখা ■ জাতীয় নির্বাচনে তৃণমূলের সুপারিশ অনুযায়ী মনোনয়নকে বাধ্যতামূলক না করা ■ রাজনৈতিক বিবেচনায় ঢাকা সিটি করপোরেশনের নির্বাচন না করা ■ বিভিন্ন উপ-নির্বাচন, পৌরসভা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অপ্রতুল নিরাপত্তা ব্যবস্থা ■ সংশোধিত সংবিধানে নির্বাচন কমিশনের ক্ষমতা না বাড়ানো
প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা	■ ভোটার তালিকা (সংশোধন) আইন ২০১০ এর মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়ার উদ্যোগ	
৯. মানবাধিকার নিশ্চিত করা		
স্বাধীন মানবাধিকার কমিশন গঠন	■ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ প্রণয়ন ■ কমিশনের চেয়ারম্যান, একজন সার্বক্ষণিক ও পাঁচ জন অবৈতনিক সদস্য নিয়োগ; কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ৪৯ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ	■ মানবাধিকার কমিশনে জনবল নিয়োগে সরকারি উদ্যোগের অভাব ■ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন বিধিমালা ২০০৯ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা ২০০৯ অনুমোদন না হওয়া
মানবাধিকার লঙ্ঘন কঠোরভাবে বন্ধ করা	■ ফতোয়ার মাধ্যমে শাস্তি প্রদানকে আইন বহির্ভূত ঘোষণা ■ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শারীরিক শাস্তি নিষিদ্ধ করা ■ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মক্ষেত্রে বোরখা পরা বাধ্যতামূলক না করা ■ ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশুর দায়িত্ব রাষ্ট্রের গ্রহণ করার	■ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা অব্যাহত - বিচার-বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, তৈরি পোষাক শিল্পের শ্রমিকদের হয়রানি ও ভয়-ভীতি প্রদর্শন, আটকদের ওপর আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা সামরিক বাহিনীর নির্যাতন, নারী নির্যাতন, সীমান্তে হত্যাকাণ্ড বন্ধে

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
	সিদ্ধান্ত	ব্যর্থতা ▪ মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে সরকারের পক্ষ থেকে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব
১০. নারীর ক্ষমতায়ন		
১৯৯৭ সালের 'নারী উন্নয়ন নীতি' পুনর্বহাল করা	▪ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ প্রণয়ন	▪ নারী উন্নয়ন নীতিতে উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সমান অধিকারের উল্লেখ না থাকা
প্রশাসনের উচ্চপদে নারীদের নিয়োগ	▪ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব - স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, কৃষি, নারী ও শিশু; প্রধানমন্ত্রীর অধীনে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদসহ ১২টি মন্ত্রণালয় ▪ সংসদীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ - সংসদ নেতা, বিরোধীদলীয় নেতা, সংসদ উপনেতা, হুইপ, সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি	
জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা		▪ জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি না করে মোট সংরক্ষিত আসন ৪৫টি থেকে বৃদ্ধি করে ৫০টি করা
নারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বৈষম্যমূলক আইন সংশোধন	▪ পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ ও সুরক্ষা আইন ২০১০ প্রণয়ন; মাতৃসূত্রে নাগরিকত্ব পাওয়া বিষয়ক আইন প্রণয়ন ▪ নারীদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি ▪ সিডও সনদের আওতায় রিপোর্ট দাখিল	▪ সম্পত্তিতে নারীর সম-অধিকার বিষয়ক কোনো আইন প্রণীত না হওয়া ▪ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের বিবাহ বিচ্ছেদ বা সম্পত্তিতে নারীর অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে আইনের বৈষম্য দূর করার জন্য কোনো উদ্যোগ না নেওয়া
নারী নির্যাতন বন্ধে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা	▪ শুধুমাত্র ধর্মীয় বিষয়ে ফতোয়া বৈধ ঘোষণা, তবে এর নামে কোনো শাস্তি দেওয়া যাবে না বলে রায় ▪ যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধে হাইকোর্টের নির্দেশনামূলক রায় ▪ নারীদের উত্যক্ত করা বন্ধ করতে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা প্রদান ▪ দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কর্মস্থলে অভিযোগ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত; প্রতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষককে কাউন্সেলিং প্রশিক্ষণ দিয়ে কাউন্সেলর পদে নিয়োগ দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত ▪ নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশু-কিশোরদের জন্য ঢাকায় ভিকটিম সাপোর্ট সেন্টার চালু	▪ নারী নির্যাতন অব্যাহত
১১. ধর্মীয় সংখ্যালঘু, অনুন্নত সম্প্রদায় ও অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নয়ন		
বৈষম্যমূলক আইনের অবসান	▪ সংসদে আদিবাসী সংক্রান্ত ককাস গঠন	▪ সংশোধিত সংবিধানে বাংলাদেশের অধিবাসীদের বাঙ্গালী অখ্যায়িত করা; আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে 'উপজাতি' হিসেবে আখ্যায়িত করার মাধ্যমে বিতর্ক সৃষ্টি; এ বিষয়ে সরকারের শক্ত অবস্থান ▪ আইনে মাত্র ২৭টি আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে তালিকাভুক্ত করা ▪ 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১' এর সংশোধনে দীর্ঘসূত্রতা
পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন	▪ খাগড়াছড়ি বিচারিক হাকিম আদালত থেকে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর আটজন কর্মচারীকে ভূমি কমিশনে নিয়োগ ▪ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করার অংশ হিসেবে ২০০৯ সালের সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ ৩৫টি অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার	▪ ভূমি কমিশন আইন সংশোধনের উদ্যোগ না নেওয়া; ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি না করে জরিপের উদ্যোগ ▪ শান্তিচুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার সম্পূর্ণ না করা ▪ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে বাঙ্গালী-পাহাড়ী দ্বন্দ্ব অব্যাহত
১২. এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা		
এনজিওদের আয়-ব্যয়ের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা	▪ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সার্বিক কার্যক্রম তদারকি ও মূল্যায়নের জন্য স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি সমন্বিত আইন প্রণয়নের উদ্যোগ ▪ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিবন্ধন নবায়ন না করার কারণে	▪ এনজিও'দের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সোস্যাল সিকিউরিটি কাউন্সিল গঠনের উদ্যোগ - এর উদ্দেশ্য নিয়ে বিতর্ক ও যথাযথ তথ্যের অভাবে এটি নিয়ে এনজিও খাতে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার সৃষ্টি

সূচক	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে অগ্রগতি	প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অন্তরায়
	৫৪৬টি এনজিও'র নিবন্ধন বাতিল; ১২ হাজার সংস্থার নিবন্ধন বাতিল প্রক্রিয়াধীন ▪ এনজিও বিষয়ক ব্যুরোর প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ ▪ বিভিন্ন ফর্ম ও আবেদনপত্র সংশোধনের উদ্যোগ ▪ এনজিও ডাটাবেজ এবং আর্থিক তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা ▪ জঙ্গী অর্থায়নে এনজিওদের ভূমিকা পর্যবেক্ষণের উদ্যোগ	

এক নজরে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির অগ্রগতি

ক্ষেত্র	নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির সাপেক্ষে ভূমিকা
দুর্নীতি প্রতিরোধ	▪ দুর্নীতি দমন ও দুর্নীতির উৎস রুদ্ধ করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ ▪ দুর্নীতি দমন কমিশনকে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালনে সহায়তা ▪ রাষ্ট্রীয় ও রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত ক্রয়-বিক্রয় ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ▪ সাধারণ মানুষের মধ্যে দুর্নীতি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলা	▪ ২০১১-১২ অর্থবছরের জাতীয় বাজেটে কালো টাকা বিনিয়োগের সুবিধা না দেওয়ার দাবি ▪ সরকারের দুদক আইন সংশোধনের উদ্যোগ নিয়ে কোনো অবস্থান না নেওয়া
কার্যকর সংসদ	▪ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিরোধী দলের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনা ▪ সংসদের স্থায়ী কমিটিগুলো দ্বিতীয় অধিবেশনের মধ্যে গঠন ও বিরোধী দলের সদস্যদের স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান করা ▪ ইস্যুভিত্তিক ওয়াকআউট ছাড়া বৈঠক বর্জন নিষিদ্ধ করা ▪ সংসদ সদস্যরা সংসদের অনুমোদন ছাড়া ৩০ দিনের বেশি সংসদ বর্জন করলে সদস্যপদ বাতিল ▪ স্পিকার বা ডেপুটি স্পিকার হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর দল থেকে পদত্যাগ ▪ বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পিকার করা	▪ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির কার্যক্রমে নিয়মিত অংশগ্রহণ ▪ জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়েই সরকারের সাথে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় না যাওয়া ▪ ধারাবাহিক সংসদ বর্জন (৭৪% কার্যদিবস); একনাগাড়ে সর্বোচ্চ ৭৪ কার্যদিবস (প্রায় দশ মাস) পর সংসদে যোগদান
বিচার বিভাগ	▪ বিচার বিভাগের পূর্ণ স্বাধীনতা নিশ্চিত করার জন্য সুপ্রিম কোর্টের অধীনে একটি স্বতন্ত্র সচিবালয় স্থাপন ▪ মামলার জট নিরসনের জন্য দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যবিধি পুনর্বিন্যাস ▪ বিচার বিভাগের কাঠামোগত সংস্কারের মাধ্যমে দুর্নীতির সুযোগ নিরসন ▪ অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের বিচার ও শাস্তি দ্রুত সম্পন্ন করা	
তথ্য অধিকার	▪ নির্বাচনের পর শপথ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে সকল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিকে সম্পদের বিবরণী প্রকাশ করতে হবে	▪ দল থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সম্পদের বিবরণী স্বেচ্ছায় প্রকাশ না করা
জনপ্রশাসন	▪ প্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি ও পদায়নের মাপকাঠি মেধা, যোগ্যতা, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা ▪ প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা ▪ প্রশাসনের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা ▪ প্রশাসনকে সব ধরনের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত রাখা ▪ সরকারি কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শ্রমিকদের জন্য বেতন ও মজুরি কমিশন গঠন	
আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী	▪ আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও সন্ত্রাস দমন ▪ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সময়োপযোগী ও দক্ষ করে গড়ে তোলা; প্রশিক্ষণ, উন্নত সরঞ্জাম, আধুনিক অস্ত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা দান	
স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা	▪ প্রশাসনকে ব্যাপকভাবে বিকেন্দ্রিকরণ করা ▪ সকল পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে জনগণের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে নিশ্চিত করা ▪ স্থানীয় নির্বাচিত প্রতিনিধিদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব বহাল রেখেই জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালী ও কার্যকর করা	▪ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় সংসদ সদস্য ও প্রশাসনের প্রাধান্য নিয়ে কোনো অবস্থান না নেওয়া
নির্বাচন কমিশন	▪ প্রবাসী বাংলাদেশিদের ভোটার করা	
মানবাধিকার	▪ মানবাধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘের সর্বজনীন ঘোষণা বাস্তবায়ন ▪ নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার সম্পর্কিত সব আন্তর্জাতিক সনদ বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা জোরদার করা ▪ মানবাধিকার কমিশনকে সুষ্ঠুভাবে কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দান	

ক্ষেত্র	নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি	প্রতিশ্রুতির সাপেক্ষে ভূমিকা
	▪ বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ বাতিল করা	
নারীর ক্ষমতায়ন	▪ মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য সহজ শর্তে কম সুদে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা ▪ নারী পেশাজীবী সৃষ্টির লক্ষ্যে মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন; নারী পেশাজীবীদের আবাসন ব্যবস্থা ▪ মেয়েদের অবৈতনিক শিক্ষা ও উপবৃত্তি স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারণ ▪ অ্যাসিড ছোঁড়া আইন দৃঢ়ভাবে বাস্তবায়ন ▪ জাতীয় সংসদসহ সকল পর্যায়ে নারীদের অধিক হারে নির্বাচনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি	▪ জাতীয় নারী নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ
সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী	▪ অনগ্রসর পাহাড়ী ও উপজাতীয় জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা; তাদের জন্য চাকরি ও শিক্ষাসহ সকল রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সুবিধা বজায় রেখে জাতীয় উন্নয়নের ধারায় অধিকতর সম্পৃক্ত করা ▪ পার্বত্য জেলায় এবং অন্যান্য স্থানে বসবাসরত উপজাতীয় ও আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা ▪ পার্বত্য অঞ্চলের জীবন ও জীবিকার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সব ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা	▪ 'আদিবাসী' শব্দ ব্যবহার বিষয়ে সরকারের অবস্থান এবং অন্যান্য গৃহীত পদক্ষেপের ক্ষেত্রে কোনো অবস্থান না নেওয়া
এনজিও খাত	▪ জাতীয় কর্মসংস্থান প্রকল্প বাস্তবায়নে দেশি-বিদেশি এনজিওদের সম্পৃক্ত করা ▪ গৃহহীনদের জন্য স্বল্প ব্যয়ে গৃহনির্মাণ ব্যবস্থায় এনজিওদের সহায়তা গ্রহণ	